আমাদের অনুপ্রেরণা

বর্ষ : ১ সংখ্যা : ১ আগস্ট ২০০৯ - জানুয়ারি ২০১০

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

হুমায়ূন রোডের খেলার মাঠের পাশে মিথিলাদের বাসা। একদিন মিথিলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্ড়ার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল 'আলোকিত মানুষ চাই' লেখা একটি গাড়ি এসে দাঁড়াল সেই রাস্ড়ায়। আর গাড়িটি ভর্তি বই। মিথিলা দেখল গাড়িটি দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই এসে সেখান থেকে বই নিয়ে যাচ্ছে। সেদিন ছিল ছুটির দিন তাই মিথিলার স্কুল ছিল না। আম্মুকে বলল, সেও গাড়ীটি থেকে বই নিবে। আম্মুর সঙ্গে মিথিলা গাড়িটির কাছে গেল এবং নাম লিখিয়ে সেখান থেকে তার পছন্দের বই নিয়ে বাসায় ফিরল। আম্মু খুব খুশি হলেন মেয়ের এই আগ্রহ দেখে। মিথিলা এখন নিয়মিত 'আলোকিত মানুষ চাই' গাড়িটি থেকে বই নেয় এবং পড়ে।

এখন বলো তো এই 'আলোকিত মানুষ চাই' লেখা গাড়িটি তোমাদের জন্য কে পাঠিয়েছেন? আমি জানি তোমরা সবাই একবাক্যে চিৎকার করে বলবে সায়ীদ স্যার। হ্যাঁ সায়ীদ স্যার, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার তোমাদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান। আর সেজন্যই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। তোমাদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে তিনি শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

আমাদের সবার প্রিয় সায়ীদ স্যার ১৯৪০ সালের ২৫ জুলাই কলকাতার পার্ক সার্কাস এ জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ছিল বাগেরহাট জেলার কামারগতির কচুয়ায়। তাঁর বাবা মরহুম আযীমউদ্দিন আহমদ ছিলেন একজন কলেজ শিক্ষক ও অধ্যক্ষ। বাবার কর্মসূত্রে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বাংলাদেশের নানা জায়গায়। খুব অল্প বয়সে তিনি মাকে হারান। তিনি ছিলেন ভাইবোনদের মধ্যে তৃতীয়।

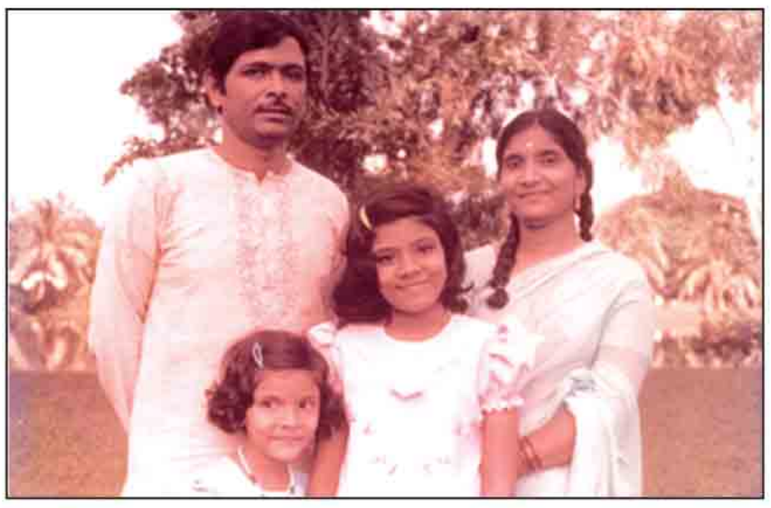

পরিবারের সাথে

সায়ীদ স্যার যখন প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন তখন তাঁরা ছিলেন টাঙ্গাইল থেকে মাইল চারেক দূরে, করটিয়ায়। পাঁচ-ছয় বছরের সেই শিশুকে পড়ানোর দায়িত্ব পান শরবিন্দু বাবু নামে এক শিক্ষক। এই শরবিন্দু বাবু হলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক। কারণ তিনি রোজ রোজ নতুন উপহার দিয়ে তাঁকে পড়ার মধ্যে আটকে রাখতেন। কবে কী উপহার আসবে এই নিয়ে তিনি সারাটা দিন অধীর হয়ে থাকতেন। এমনি করে কখন যে একসময় পড়ার আনন্দ আর উপহার পাওয়ার আনন্দ এক হয়ে গিয়েছিল টের পাননি তিনি। এক সময় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অনুভব করলেন শিক্ষক শরবিন্দুর বাবুর আদরের ভেতর থাকতে থাকতে পড়াশোনাকে ভালবেসে ফেলেছেন তিনি।

বাবার চাকরির কারণে তিনি দেশের বিভিন্ন স্কুল ঘুরে অবশেষে পাবনা জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন বাগেরহাট প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে। তিনি ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি এ (অনার্স) ও ১৯৬১ সালে একই বিষয়ে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জীবনে তাঁর পিতার শিক্ষা ও আদর্শ সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন খ্যাতিমান শিক্ষক। শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার হিসাবে তিনি সেকালে দেশের সুধীমহলে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বাবাকে তাঁর ছাত্ররা দেবতার মতো ভক্তি করতেন। তাঁর বাবার প্রতি তাঁর ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখে তিনি ছোটবেলাতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পড়াশুনা শেষ করে বাবার মতো একজন আদর্শ শিক্ষক হবেন।

তাঁর ছেলেবেলায় নেওয়া সেই সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হয় ১৯৬১ সালে। কারণ ১৯৬১ সালে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রথম শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে। তখন তাঁর বয়স ছিল বাইশ বছর। এম.এ. পরীক্ষা দেবার পরপরই তিনি ঐ কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সেই সময়ে মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁর বাবা আযীমউদ্দীন আহমদ। ছেলে একই কলেজে যোগ দিলে তাঁর জন্য প্রশাসনিক অস্বস্তির কারণ হবে মনে করে তিনি কলেজের গভর্ণিং বোর্ডের সভায় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের শিক্ষক হিসেবে যোগদানের ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল ভাল থাকায় কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে কলেজের খন্ডকালীন প্রভাষক হিসাবে তাঁকে নিয়োগের সিদ্ধান্ড় নেন। গভর্নিং বডির সচিব হিসাবে তাঁর বাবাকেই তাঁর নিয়োগপত্র পাঠাতে হয়েছিল।

সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তটি জমে উঠেছিল কলেজে তাঁর যোগদানের প্রথম দিনটিতে। সেইসময় প্রথম দিনের ক্লাশে ছাত্রদের সঙ্গে নতুন শিক্ষকদের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব অধ্যক্ষই পালন করতেন, এটাই ছিল নিয়ম। সায়ীদ স্যারের ব্যাপারে তাঁর বাবাকেও তাই করতে হলো। রুটিন মাফিক বাবার পেছনে পেছনে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর একটি শাখায় গিয়ে হাজির হলেন তিনি। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর বাবা সংক্ষিপ্ত ইংরেজি ভাষণে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের একটা ছোটখাট পরিচয় তুলে ধরে সব শেষে বললেন, যেহেতু ওর শরীরে শিক্ষকের রক্ত আছে আমার মনে হয় ও ভাল শিক্ষকই হবে। কিন্তু সায়ীদ স্যারের ধারণা ছিল, নিয়োগের দ্বন্দ্বে পরাজয়ের ফলে তাঁর বাবা হয়তো ভেতরে ভেতরে তাঁর উপর কিছুটা তেতে আছেন। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর সেদিনের বক্তব্যে সেই ক্রোধের কিছু প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু ঘটনা হলো ঠিক উল্টো। বক্তৃতার সময় তাঁর বাবার গলা কিছুটা ধরেই এল। মনে হল তাঁর উত্তরসূরীর আসনে নিজ হাতে তাঁকে বসিয়ে যেতে পেরে তিনি যেন ভেতরে ভেতরে গর্বিত এবং পরিতৃপ্ত।

এরপর হরগঙ্গা কলেজ থেকে তিনি সিলেট মহিলা কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। সেই সময় মহিলা কলেজে যোগ দেওয়া তরুণ শিক্ষকদের জন্য সহজ ছিল না। কারণ তখন সিলেটের সমাজ খুবই রক্ষণশীল ছিল। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায় সেই কলেজে তাঁর চাকরিটা তখন হয়ে যায়। তবে এখানে তিনি বেশিদিন ছিলেন না। চাকরি পাওয়ার মাস দুয়েক পরই বাম ছাত্র আন্দোলনের মুখে কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর বিভিন্ন কলেজ ঘুরে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ঢাকা কলেজে আসেন এবং ১৯৯২ সালে ঢাকা কলেজের অধ্যাপনার পদটি ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর অধ্যাপনা জীবনের সমাপ্তি ঘটান। তিনি কখনও অন্যায়ের সাথে আপোষ করেন নি। তাঁর শিক্ষকতা পেশার একটি ঘটনা থেকে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হওয়া যায় - পরীক্ষায় কম নাম্বার পাওয়ায় বিরাট বিত্তশালী এক ব্যক্তির ছেলেকে কলেজে ভর্তি করাননি তিনি। ছেলেকে ভর্তি করানোর জন্য তিনি শিক্ষা মন্ত্রীকে দিয়ে পর্যন্ড় সুপারিশ করান। কিন্তু অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সেই অনুরোধ রাখেন নি।

ভদ্রলোক রেগে গিয়ে তাঁকে বলেন, "আপনার মতো একশোটা মাষ্টারকে আমি কিনতে পারি"। সায়ীদ স্যার উত্তর দিলেন, "আপনার মত একশোটা অশিক্ষিতকে আমি লেখাপড়া শেখাতে পারি। যে ছাত্র একবার জানতে পারে তার শিক্ষকেরা তার বাবার টাকায় কেনা, সে কখোনো মানুষ হয়না। ওর লেখাপড়া হওয়ার কোনো কারণ নেই।"

এবার আসি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র প্রসঙ্গে। এই চিন্ড়াটি প্রথম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মনে জাগে ১৯৬৮ সালের দিকে। তখনই কিছু মেধাবী এবং প্রতিভাবান তরুণকে নিয়ে তিনি এধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তাতে ছেদ পড়ে। তারপর স্বাধীনতা আসে। তাঁদের সামনে এক বিপুল সম্ভাবনার জগৎ উন্মোচিত হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ১৯৭৮ সালের পর থেকে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে একটু একটু করে, অনেক দিনে। এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মুখে নানা উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে তিনি সামনে এগিয়ে গেছেন, গড়ে তুলেছেন আজকের বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র।

এই কেন্দ্র পরিচালিত বই পড়া কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের হাজার হাজার স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও কেন্দ্র পরিচালিত আরো নানারকম সামাজিক কাজ দেশ-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে

সায়ীদ স্যার কিন্তু খুব ভাল উপস্থাপনা করেন। তবে তিনি খুব ভাল উপস্থাপনা করেন একথা বললেই পর্যাপ্ত বলা হয় না, বরং আমরা বলতে পারি বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় তিনি সেরা।

এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি নিজের লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছেন নিবিষ্ট মনে। কবিতা, প্রবন্ধ, ছোট গল্প, নাটক, অনুবাদ, জার্নাল, জীবনীমূলক বই সব মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থভাণ্ডারও যথেষ্ঠ সমৃদ্ধ।

১৯৬৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর রওশনারা বেগমের সঙ্গে বিবাহ। তাঁদের দুই কন্যা। ১৯৬৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বড় মেয়ে লুনা সায়ীদের জন্ম। ১৯৭১ সালের ৩০ আগস্ট দ্বিতীয় কন্যা রঞ্জনা সায়ীদের জন্ম।

একুশে পদক, র‍্যামন ম্যাগস্যাসে পুরস্কার, জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কারসহ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অনেক বড় বড় পুরুস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ■

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

মেয়েটির নাম সালমা। হরিপুর গ্রামে সে তার মার সাথে থাকে। কয়েকদিন ধরে সালমা খুব কান্নাকাটি করছে। কারণ বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তার মা অনেক কষ্টে ক্লাস নাইন পর্যন্ত তার পড়াশুনা চালিয়ে গেলেও সালমা এবার ক্লাস টেনে উঠতে পারল না। কারণ তার মা পড়াশুনার খরচ চালাতে পারছেন না। সালমার অন্যান্য সহপাঠিরা ক্লাস টেনে উঠে গেছে। কিন্তু টাকার অভাবে সালমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। সালমার মা চোখের সামনে অন্ধকার দেখছেন। মেয়ের পড়াশুনা তো দূরের কথা এখন হাতের এমন অবস্থা যে মেয়েকে নিয়ে তিনি দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকবেন কিভাবে, এই ভেবে দিশেহারা হচ্ছেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর তার জমানো কিছু টাকা আর সংসারে কাঁসার থালা-বাটি-ঘটি যা ছিল সব একে একে বিক্রি করে মেয়ের পড়াশুনার খরচ চালিয়েছেন। মেয়েটি তার পড়াশুনায় ভাল বলে ভেবেছিলেন যত কষ্টই হোক তার পড়াশুনা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু এখন চোখের সামনে শুধুই অন্ধকার।

সালমাকে কয়েকদিন ধরে স্কুলে যেতে না দেখে একদিন সালমার সহপাঠি মুনিরা এল তার খোঁজ নিতে।

সব শুনে বাড়ি ফিরে মুনিরা তার মার কাছে সালমার দু:খের কথা জানাল। মুনিরার মা সালমার মার কাছে এলেন এবং তাঁকে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেই টাকা দিয়ে গরু কেনার পরামর্শ দিলেন। কারণ এই গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েই তিনি মুনিরার পড়াশুনার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। সালমার মা মুনিরার মার কথা মতো গ্রামীণ ব্যাংকে গেলেন এবং ঋণ নিয়ে একটি গরু কিনলেন, যার দুধ বিক্রি করে সালমার পড়াশুনার খরচসহ দু'মা-মেয়ের সংসার দিব্বি চলে যাচ্ছে। আর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারছে বলে সালমার মুখেও এখন হাসি ফুটে উঠেছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

এই গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে যিনি গ্রামের হাজার হাজার গরীব, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন তিনি হলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

কিন্তু এইসব গরীব সুবিধা বঞ্চিতদের মুখে হাসি ফুটাতে যেয়ে তাঁকে পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেইসময় গ্রামে নানারকম কুসংস্কার ছিল। গ্রামের মৌলবীরা নারীদেরকে গ্রামীণ ব্যাংকে যেতে নিষেধ করত। তারা নারীদেরকে বুঝাত গ্রমীণ ব্যাংকে গেলে তাদের হাবিয়া দোজখে যেতে হবে। মৌলবীরা মুহাম্মদ ইউনূসসহ ব্যাংকের লোকজনদেরকে গ্রামে ঢুকতে দিত না, ঢুকলে তাদেরকে মেরে ফেলার হুমকি দিত তারা। কিন্তু সব বাধা আর কুসংস্কার দূরে ঠেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছেন মুহাম্মদ ইউনূস, গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছেন গ্রামীণ ব্যাংক। যেখান থেকে ঋণ নিয়ে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ তাদের ভাগ্য উন্নয়ন করছেন।

আর এভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য ড. মুহম্মদ ইউনূস এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকে ২০০৬ সালে যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। হতদরিদ্র মানুষের জন্য ক্ষুদ্রঋণের প্রবক্তা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ ইউনূস এ পুরস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান বয়ে এনেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ড. অমর্ত্য সেনের পর তিনিই নোবেল বিজয়ী বাঙালি।

১৯৪০ সালে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই ভয়াবহ যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই চট্টগ্রাম থেকে সাত কিলোমিটার দূরে বাথুয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ড. মুহম্মদ ইউনূস জন্মগ্রহণ করেন।

ড. ইউনূসের বাবা দুলামিয়া ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। মা সুফিয়া খাতুন ছিলেন ব্যক্তিত্বময়ী ও মমতাময়ী একজন নারী।

নোবেল পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন

ছোটবেলা থেকেই স্কুলের বই ছাড়াও গল্পের বই বা পত্রিকা পড়ার প্রতি অসম্ভব ঝোঁক ছিল মুহাম্মদ ইউনূসের। বিশেষ করে রহস্য, রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা কাহিনীর বেশী ভক্ত ছিলেন। এরপর একদিন তিনি নিজেই একটি রহস্য কাহিনী লিখে ফেলেছিলেন।

তাঁর ছেলেবেলার আর একটি শখ ছিল ছবি তোলা। চট্টগ্রাম জেলায় বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ার সুবাদে হাতে কিছু নগদ টাকা পেয়েছিলেন। আরও কিছু টাকা জমিয়ে বড়ভাই সালামকে নিয়ে একটি বক্স ক্যামেরা কিনে ওটা নিয়ে তিনি সর্বত্র ঘুরতেন। ছাদ থেকে বিশেষজ্ঞের মত বিষয় ও দৃশ্য নির্বাচন করতেন। সঙ্গী থাকতেন এক ষ্টুডিওর মালিক। তাঁর সহযোগিতা নিয়ে ছবি প্রিন্ট করার কাজটি করতেন। এর পর কিনেছিলেন একটি ফোল্ডিং ক্যামেরা। পেশাদার শিল্পীর কাছে কিছুদিন শিক্ষাও নিয়েছিলেন। এরফলে ছবি আঁকা ও রং করার প্রতি জন্মেছিল প্রচন্ড অনুরাগ।

ড. ইউনূসের হাতে খড়ি হয়ে ছিল চট্টগ্রামের লামার বাজার বক্সি হাট রোডের নিজ বাসার কাছাকাছি একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর তিনি ভর্তি হলেন কলেজিয়েট স্কুলে। এই স্কুলটি পড়াশুনার ক্ষেত্রে ছিল খুব উন্নত। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় প্রতি বছরই তিনি প্রথম হতেন। পড়াশুনা ছাড়াও তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করত বয়স্কাউটের সুনাম। ব্যায়াম, খেলাধুলা, নানা শিল্পকর্ম, আলোচনা সভায় যোগদান, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ক্যাম্প করা ও ক্যাম্প ফায়ারে বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদি তাঁকে বিশেষ উৎসাহ যোগাত। ১৯৫৩ সালে করাচীতে বয়স্কাউটের বিরাট জাতীয় সমাবেশ জাম্বুরীতে (Jamboree) অংশ নিয়েছিলেন। তখন ড. ইউনূসের বয়স ছিল তের বছর। স্কাউট হিসেবে ১৯৫৫ সালে বিশ্ব জাম্বুরীতে গিয়েছিলেন কানাডা এবং ১৯৫৯ সালে জাপান ও ফিলিপাইন সফরে গিয়েছিলেন তিনি।

স্কুলের পাঠ শেষ করে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন ড. ইউনূস। ১৯৫৭-১৯৬০ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করেন তিনি। ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝিতে তিনি ফুলব্রাইট স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকায় চলে যান।

ড. ইউনূসের কর্মজীবন ছিল খুবই বর্ণিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি নিজেকে শিক্ষকের ভূমিকায় কল্পনা করতেন। ছেলেবেলার সেই কল্পনা একসময় বাস্তবে রূপ নেয়। ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি তাঁর প্রাক্তন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। তখন ড. ইউনূসের বয়স ছিল মাত্র ২১ বছর। মজার ব্যাপার হল ছাত্ররা ছিল ড. ইউনূসের প্রায় সমবয়স্ক। ১৯৬১-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ড. ইউনূসের বাবা ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তাই শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি ব্যবসার প্রতিও উৎসাহী হয়ে উঠেন।

১৯৭০ সালে মধ্য টেনেসি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেছেন তিনি। ১৯৯৬ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইউ এন ফাউন্ডেশনসহ কমপক্ষে দশটি আন্তর্জাতিক সংস্থার পর্যালোচনা সদস্য বা উপদেষ্টা হিসেবে আছেন।

১৯৭২ সালে ড. ইউনূস আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পর সরকারের পরিকল্পনা কমিশনে যোগ দেন। কিছুদিন পরেই এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এখন পর্যন্ত সেই দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

১৯৭০ সালে রাশিয়ান সাহিত্যে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রীধারী ভিরা ফোরোস্টেনকে বিয়ে করেন ড. ইউনূস। ১৯৭৭ সালের পয়লা মার্চ মেয়ে মনিকার জন্মের পর ভিরা মেয়েকে নিয়ে আমেরিকায় চলে গেলেন এবং ড. ইউনূসকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য বললেন। কিন্তু নিজের দেশ ছেড়ে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে থাকতে রাজি হলেন না ইউনূস। বাংলাদেশকে জন্মের মত ছেড়ে যাবার কথা কল্পনাতেও আনতে পারেননি তিনি। এরফলে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে ইউনূস ও ভিরার দশ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ঘটে বিবাহ বিচ্ছেদ। মেয়ে মনিকা ভিরার সাথেই আমেরিকায় থেকে যায়।

এরপর ১৯৮০ সালের এপ্রিলে দ্বিতীয়বার আফরোজীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ড. ইউনূস। বিয়ের পর পরই আফরোজী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এখন তিনি অবসর জীবন যাপন করেছেন। ১৯৮৬ সালের ২৪ জানুয়ারী তাদের সন্তান দীনা ইউনূসের জন্ম হয়।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস লেখক হিসেবে দেশে ও দেশের বাইরে সুনাম অর্জন করেছেন। তার লেখা 'আমার জীবন ও গ্রামীণ ব্যাংক' বইটি অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছে। বইটি চৌদ্দটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এছাড়া তিনি আরও উল্লেখযোগ্য অনেক বই লিখেছেন।

নোবেল শান্তিপুরস্কার ছাড়াও তিনি দেশ-বিদেশের অনেক সম্মানজনক পুরুস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ■

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

গভীর রাতে কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল আয়েশা ফায়েজের। শঙ্কিত মন নিয়ে তাড়াহুড়ো করে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন তিনি। এসে দেখেন তাঁর মেজো ছেলে ইকবাল কাঁদছে। সেই কান্নার শব্দে আস্তে আস্তে বাড়ির সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং সবাই উঠে এলেন ইকবালের কাছে। ইকবাল কাঁদছে কারণ- আশি বছর পর তাকে মরে যেতে হবে। ঘুমাতে যাবার আগে তার বাবা তার হাত দেখে বলেছেন- "তুমি তো দীর্ঘজীবী। প্রায় আশি বছর আয়ু তোমার।" আশি বছর পর সে মরে যাবে, এ কথা ভাবতেই ইকবালের কান্না পাচ্ছে। ইকবালের কান্না দেখে তার বাবা আবার তার হাতটা টেনে নিয়ে ভাল করে দেখলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি একশ বছর বাঁচবে।' একশ সংখ্যাটি বালক ইকবালের কাছে অনেক বেশি মনে হওয়ায় মুহূর্তেই খুশি হয়ে উঠল সে।

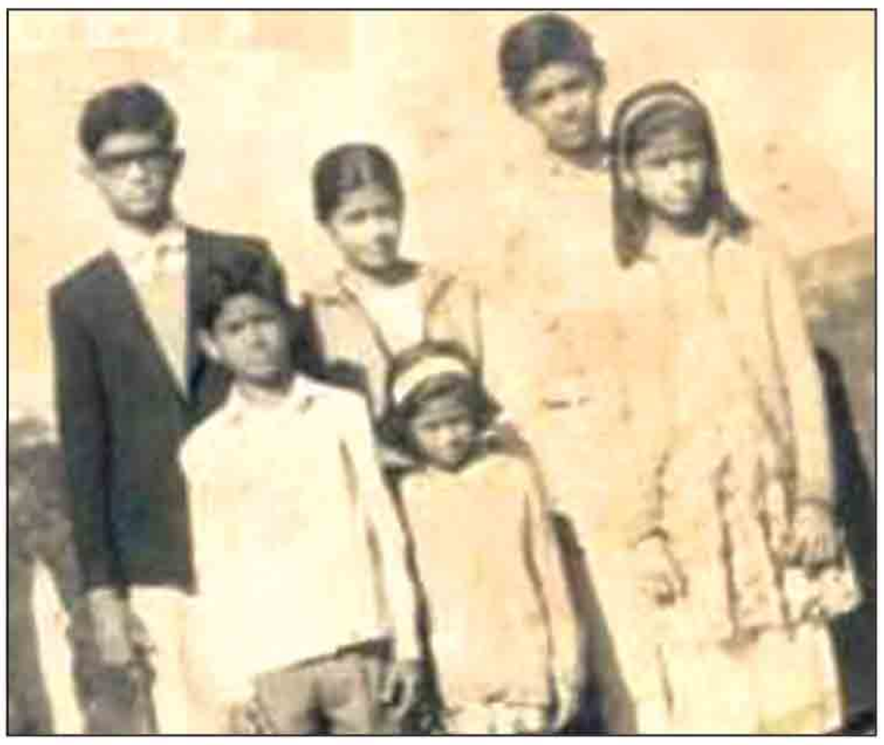
ভাই-বোনদের সাথে

সেদিনের ইকবাল নামের সেই ছোট্ট ছেলেটিই হচ্ছে তোমাদের সবার প্রিয় লেখক জাফর ইকবাল। যাঁর লেখা বই হাতে নিলে তোমাদের কারও কারও চোখের ঘুম এক দৌড়ে পালিয়ে যায়। মা খেতে বললে বলো, ক্ষিদে নেই। কারণ বইটি শেষ না করে যে মন উঠতেই চাইছে না। পরীক্ষার সময় এলে কেউ কেউ আবার বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখো তোমাদের প্রিয় এই লেখকের বই। কি রাখো না? রাখবেই তো। কারণ পরীক্ষার সময় এলে তো মা ক্লাসের বই ছাড়া গল্পের বই পড়তেই দেননা। মা জেগে থাকতে তোমাদের প্রিয় এই লেখকের বই পড়ার কোন উপায়ই নেই। আর তাইতো তোমরা বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখো তাঁর লেখা তোমাদের পছন্দের বইটি। মা ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুপি চুপি বালিশের তলা থেকে বইটি বের করে পড়া শুরু করো। তাঁর লেখা দীপু নাম্বার টু, হাত কাটা রবিন, তিন্নী ও বন্যাসহ আরও অজস্র মজার মজার বইগুলি তোমাদের মধ্যে কারও কারও মুখস্ড়ও হয়েছে বোধহয়। আর তাঁর লেখা কপোট্রনিক সুখদু:খ, নয় নয় শূন্য তিন, জলমানব, অবনীলসহ সুন্দর সুন্দর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী হাতে নিলে তো তোমাদের নিজের নামটিও ভুলে যাওয়ার দশা হয়। যেগুলিকে আবার তোমরা সায়েন্সফিকশানও বলে থাকো।

তিনি শুধু যে তোমাদের জন্য লিখেছেন তা কিন্তু নয়। তোমাদের জন্য লেখার পাশাপাশি তিনি বড়দের জন্যও লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক-রাজনৈতিক অসামাঞ্জস্যতাসহ বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বড়দের জন্যও তিনি অনেক কিছু লিখেছেন।

ছেলেবেলায় প্রচুর বই পড়ার নেশা ছিল জাফর ইকবালের। স্বপন কুমার, দস্যু বাহারাম, মাসুদ রানাসহ দেশি-বিদেশী অনেক লেখকের বই পড়তে পড়তে বড় হয়েছেন তিনি। আর এসব বই পড়তে পড়তে একসময় তিনি লেখালেখি শুরু করেন। তিনি পড়ার এই অভ্যাসটা পেয়েছেন বাবা ও তাঁর বড় ভাই জনপ্রিয় সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের কাছ থেকেই। কারণ তাঁদের নেশার বড় একটা অংশ জুড়ে ছিল বই পড়া। ছেলেবেলা থেকে একটা সম্পদের ছড়াছড়ি দেখে বড় হয়েছেন জাফর ইকবাল, আর তা হলো বই।

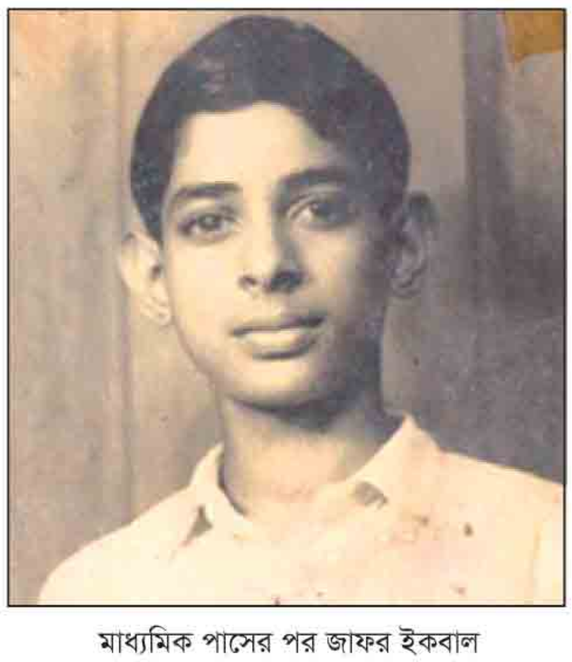
মাধ্যমিক পাসের পর জাফর ইকবাল

তোমাদের এই প্রিয় লেখকটির জন্মদিন কিন্তু দু'টো। কি খুব অবাক হচ্ছো তোমরা। হয়তো ভাবছ ওমা একজন মানুষ আবার দু'বার জন্মায় নাকি? না তিনি অন্য সবার মতো একবারই জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু দু'টো জন্মদিন হওয়ার রহস্যটা এবার বলি শোন-১৯৫২ সালের ২৩ ডিসেম্বর। এ দিনটিতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় শিক্ষকরা নিজেদের খেয়াল খুশিমতো সেটা করেছেন ১৯৫৩ সালের ৬ আক্টোবর। আর শিক্ষকদের দেয়া এই তারিখটিই তাঁকে বহন করতে হয়েছে সব সার্টিফিকেটে, পাসপোর্টে এবং সবধরনের দাপ্তরিক কাজে।

জাফর ইকবালের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার কুতুবপুরে। কিন্তু সেখানে স্থির থাকেননি তিনি। বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদ পুলিশ অফিসার হওয়ায় ছেলেবেলা কেটেছে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে। বাবার চাকরির সুবাদে বাবা-মা এবং পাঁচ ভাইবোনদের সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল দেখার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। সিলেটের কিশোর মোহন পাঠশালায় পড়াশুনার শুরু হলেও সেখানে বেশি দিন স্থির হননি। বাবার বদলির কারণে ঘুরতে হয়েছে বিভিন্ন স্কুলে। বিভিন্ন স্কুল ঘুরে মাধ্যমিক পাশের পর উচ্চমাধ্যমিকে এসে স্থির হন ঢাকা কলেজে। উচ্চমাধ্যমিক সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে। ১৯৭৩ সালে অনার্সে একনম্বরের ব্যবধানে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। আর ১৯৭৪ সালে লাভ করেন মাস্টার্স ডিগ্রি। এরপর চলে যান আমেরিকায় পিএইচডি করার জন্য। ১৯৮২ সালে এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্সে অর্জন করেন পিএইচডি ডিগ্রি।

জাফর ইকবাল দেশের বাইরে বিজ্ঞানী হিসাবে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে পিএইচডি করেন। এরপর পৃথিবী খ্যাত ক্যালটেকে পোস্ট ডক্টরাল কাজ করতে যান। সেখান থেকে যান বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে গবেষণা করতে। তিনি নিযুক্ত ছিলেন ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে তৈরীর কাজে। তাঁর তৈরী করা টাইম প্রজেকশন সুইজারল্যান্ডের এক পাহাড়ের নিচে বহুদিন ধরে ডাটা সংগ্রহের কাজ করছে। বিজ্ঞানী জাফর ইকবাল Electronics, Computer Science and Engineering, Bangla Computerization, Networking, Non-Linear Optics এবং পদার্থ বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন গবেষণা মূলক কাজ করেছেন। লেখালেখির সাথে সাথে গবেষণার কাজকেও প্রচন্ড আনন্দদায়ক মনে করেন তিনি।

নিজের দেশকে তিনি প্রচন্ড ভালবাসেন। আর তাইতো আমেরিকার মতো উন্নত দেশে থাকার পরও প্রতিমুহূর্তে দেশে ফেরার জন্য ছটফট করেছেন। আত্মীয়-স্বজনরা বারবার নিষেধ করার পরও তিনি ১৮ বছরের নিশ্চিন্ড় জীবন ছেড়ে স্ত্রী ইয়াসমিন হক ও দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে দেশের টানে চলে এসেছেন দেশের মাটিতেই। দেশে ফিরে এসে তিনি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার কারিগর হিসাবে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান এবং এপ্লায়েড সায়েন্সেস এন্ড টেকনোলজির ডিন হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জীবনে বহু সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

অনেক বড় বড় দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেও তিনি কিন্তু সবসময় তোমাদের কথাই ভাবেন। আর তাইতো তিনি তোমাদের ছোট্ট মনটাকে বুঝতে পারেন। তাঁর বুঝতে একটুও কষ্ট হয়না অংক দেখে তোমাদের ছোট্ট অন্তরটা কেমন করে কেঁপে ওঠে। তোমাদের এই ভয় দূর করতেই তোমাদেরকে গণিতে আগ্রহী করে তোলার জন্য সারা দেশব্যাপী গণিত অলিম্পিয়াড কার্যক্রম চালু করেছেন জাফর

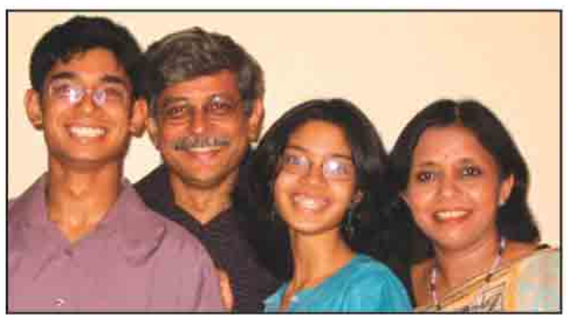
পরিবারের সাথে ২০০৬ সালে

ইকবাল। ধীরে ধীরে এই গণিত অলিম্পিয়াড কার্যক্রমটি গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন তোমাদের মতো ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা মহাউৎসাহে জটিল জটিল অংকের সমাধান করছে। এছাড়াও তিনি চান তাঁর দেশের ছেলেমেয়েরা দেশপ্রেমিক, ইতিহাস সচেতন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জল মানুষ হিসাবে তৈরী হোক। তোমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখোনি এই তোমাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোন নামে একটি অনুষ্ঠান করেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের কথা এলেই বাবার কথা ভীষণভাবে মনে পড়ে জাফর ইকবালের। এই মহান মুক্তিযুদ্ধেই তাঁর বাবাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাঁর বাবার অপরাধ ছিল তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন। এই অপরাধের কারণে পাকস্তানি সৈন্যরা তাঁর বাবাকে ধরে নিয়ে যেয়ে নির্মমভাবে হত্যাকরে লাশ ফেলে দেয় ধলেশ্বরীর পানিতে।

তিনি কিন্তু কখনই অন্যায়কে মেনে নেন না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সবসময় সোচ্চার হয়ে ওঠেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। সমাজে কোনো অন্যায় দেখার সাথে সাথে তাঁর কলম সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ওঠে। আর এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তাঁর বাড়িতে বোমা মারা হয়েছে। পাঠানো হয়েছে কাফনের কাপড়। ছেলেবেলায় একদিন যে বালকটি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে কেঁদে সারা হয়েছিল বড় হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তাঁকে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সাথে পথ চলতে হচ্ছে। কিন্তু তিনি একমুহূর্তের জন্যও থেমে যাননি। হাজারও হুমকি-ধামকি আর কাফনের কাপড়ের মধ্যে বাস করেও ছেলেবেলার সেই ছোট্ট ইকবাল মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে পথ চলছেন নির্ভয়ে। আর অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বলিষ্ঠকণ্ঠে। ■

ছোটবেলায় বই হাতে মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সম্পাদক
মৌরী তানিয়া

অলংকরণ
মোঃ শাহজাহান কাজী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ঊর্মি লোহানী
আশরাফি ফেরদৌসী
সাবিরা সুলতানা
আয়েশা সিদ্দিকা

প্রকাশক
গুণীজন প্রোগ্রাম, ডি.নেট

মুদ্রণে
পাথওয়ে

যোগাযোগ
৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব- ক-বি, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল : info@gunijan.org.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.gunijan.org.bd
ফোন ঃ +৮৮০২৮১৫৬৭৭২, +৮৮০২৯১৩১৪২৪
+৮৮০১৮১৪৬৫২৪৯৬-৭
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০২৮১৪২০২১

আমাদের অনুপ্রেরণা

বর্ষ : ১ সংখ্যা : ১ আগস্ট ২০০৯ - জানুয়ারি ২০১০

সুফিয়া কামাল

সুফিয়া কামাল

অনেক অনেক দিন আগে এমন একটা সময় ছিল যখন কোন মেয়েকে স্কুলে যেতে দেয়া হতো না। বড় বড় মেয়েদেরকে তো বটেই ছয়, সাত বা দশ বছরের ছোট ছোট মেয়েদেরকেও স্কুলে যেতে দেয়া হতো না। আর এরকম সময়ে ১৯১১ সালের ২০ জুন জন্মগ্রহণ করলেন আমাদের সবার প্রিয় কবি বেগম সুফিয়া কামাল। তাঁর মায়ের নাম সাবেরা খাতুন আর বাবার নাম সৈয়দ আবদুল বারী। সুফিয়ার যখন সাত মাস বয়স তখন তাঁর বাবা বাড়ি থেকে সাধনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। আর ফিরেননি তিনি। তখন সুফিয়ার মা কোন উপায় না দেখে ছোট সুফিয়াকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন তাঁর নানার বাড়িতে।

সুফিয়ার নানা ছিলেন শায়েস্তাবাদের নবাব। নানা বাড়ির নবাবি পরিবেশের মধ্যে সুফিয়া অতি আদরে বড় হতে লাগলেন। সুফিয়ার যখন সাত বছর বয়স তখন একদিন নবাব বাড়ির অতি আদরের এই নাতনীটি বায়না ধরলেন- 'স্কুলে যাব স্কুলে যাব'। বাড়ির সবাই যেন আকাশ থেকে পড়ল। নানা বাড়ির লোকজন অনেক বুঝানোর চেষ্টা করলেন তাঁকে কিন্তু কিছুতেই বায়না থামে না। 'স্কুলে যাব স্কুলে যাব'। কি আর করা শেষে পায়জামা-আচকান পরিয়ে মাথায় টুপি দিয়ে রীতিমত ছেলে সাজিয়ে স্কুলে পাঠানো হল তাঁকে। কিন্তু এটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম এবং শেষ স্কুল। এরপর আর কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়নি তাঁর। তবে স্কুলে না গেলেও তাঁর পড়াশুনা থেমে থাকেনি। তিনি ঘরে বসেই তাঁর পড়াশুনা চালিয়ে গেছেন। শায়েস্তাবাদের নবাব পরিবারের লোকজন সে সময় উর্দূ ভাষায় কথা বলতো। ঘরে তারা আরবি ও ফারসি ভাষা শিখতো। বাংলা শেখার কোন উপায় ছিলনা। তবে শিশু সুফিয়াকে বাংলা শিখিয়েছিলেন তাঁর মা। নানাবাড়িতে তাঁর বড় মামার বিরাট একটি লাইব্রেরি ছিল। মায়ের উৎসাহ ও সহায়তায় এ লাইব্রেরির অনেক বই শিশু সুফিয়া চুরি করে পড়তেন এবং বাংলা শেখার চেষ্টা করতেন।

সেসময় খুব অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার প্রচলন ছিল। তাই সুফিয়ারও খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। ১৯২৪ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মামাত ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে বেগম সুফিয়ার বিয়ে হয়েছিল। সেসময় সবাই মেয়েদের পড়াশুনার বিরোধী হলেও তাঁর স্বামী নেহাল হোসেন কিন্তু ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি সুফিয়ার লেখালেখির বিরোধিতা করেননি বরং সবসময় তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। স্বামীর সহযোগিতায় সুফিয়ার লেখাপড়া এবং লেখালেখির গতি আরো বাড়তে থাকে। ১৯৩২ সালে সুফিয়ার স্বামী নেহাল হোসেন দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ড় হয়ে মারা যান। রেখে যান ৬ বছরের একমাত্র কন্যাসন্তান আমেনা খাতুন দুলুকে। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে সুফিয়ার জীবনে নেমে আসে চরম দুর্যোগ ও দুর্ভোগ। এই সময়ে সবকিছু বিবেচনা করে সুফিয়া নিজেই সংসারে আয় করার সিদ্ধান্ত নেন। কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি নেন তিনি। সেসময় তাঁর বেতন ছিলো পঞ্চাশ টাকা।

দ্বিতীয় স্বামী কামাল উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে

১৯৩৯ সালের ৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের কামালউদ্দিন খানের সাথে তাঁর পুনরায় বিবাহ হয়। এ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। এই দুই মেয়ের মধ্যে এক মেয়ে বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী ও সমাজকর্মী সুলতানা কামাল। মায়ের মতোই তিনি মানব হিতৈষি একজন নারী। ১৯৭৭ সালে সুফিয়া কামালের দ্বিতীয় স্বামী কামালউদ্দীন খানও মারা যান। কামালউদ্দীন খানও সুফিয়ার পড়াশুনার বিরোধিতা করেননি। বরং সবসময় তাঁকে সহযোগিতা করেছেন।

সুফিয়া কামাল কিন্তু হঠাৎ করেই এত বড় কবি হয়ে ওঠেননি। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে আস্তে আস্তে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। ১৯২৪ সালে বিয়ের পর প্রথম স্বামী নেহাল হোসেনের সঙ্গে তিনি বরিশাল শহরে চলে আসেন। তাঁর স্বামীর সহায়তায় বরিশালের উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক 'তরুণ' পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় মিসেস এস.এন. হোসেন নামে সুফিয়ার প্রথম লেখা 'সৈনিক বধূ' প্রকাশিত হয়। প্রথম লেখা প্রকাশের সাথে সাথে হিন্দু-মুসলমান সবাই খুব প্রশংসা করেন।

এরপর কাজী নজরুল ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুফিয়া 'সওগাত'-এ লেখা পাঠান এবং সেগুলি প্রকাশিতও হয়। এ সময় থেকেই কবি-সাহিত্যিক মহলে সুফিয়ার পরিচয় ঘটে। মোহাম্মাদ নাসির উদ্দিন ১৯২৯ সালে লেখিকাদের ছবিসহ 'মহিলা সওগাত' প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। মজার ব্যাপার হলো সেসময় মুসলিম মহিলারা ছবি তুলতেন না। কিন্তু সুফিয়া কলকাতার একটি স্টুডিওতে যেয়ে ছবি তুললেন। পরে ওই ছবিসহ সুফিয়ার কবিতা 'মহিলা সওগাত'-এর প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর জীবনের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কেয়ার কাঁটা' ও ১৯৩৮ সালে কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া'। এছাড়া তাঁর আরও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নারীদের পত্রিকা 'সাপ্তাহিক বেগম' এর প্রথম সম্পাদিকা হয়েছিলেন কবি সুফিয়া কামাল।

তিনি শুধু যে লেখালেখি করেছেন তা কিন্তু নয়। অনেক সামাজিক কাজও করেছেন। নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত ছিলেন তিনি। আর অনগ্রসর মহিলাদের জন্য কাজ করে গেছেন সারাজীবন। ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় কার্ফ্যুর মধ্যে মৌন মিছিলে নেতৃত্ব দেন তিনি। তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর। এটি ছিল তাঁর সংগ্রামী জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যা সেসময় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সংগ্রামরত দেশবাসীকে উজ্জীবিত করেছিল। তিনি নারী 'পুনর্বাসন সংস্থা'র সভানেত্রী ছিলেন। স্বাধীনতার পর 'মহিলা পরিষদ' এর মাধ্যমে নারী সমাজের সার্বিক মুক্তির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী গোষ্ঠী 'মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১'-র বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালান। ১৯৬৩ সালে নারী মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন সংগঠন এর বিরোধিতা করেন। আর এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন শামসুন্নাহার মাহমুদ ও সুফিয়া কামাল। ১৯৬৯-এ আইয়ুব বিরোধী মহিলাদের সমাবেশে সভানেতৃত্ব করেন এবং মিছিলে নেতৃত্ব দেন তিনি। ৭০- এর ঘুর্ণিঝড়ে দক্ষিণ বাংলায় রিলিফ বিতরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বেগম সুফিয়া কামাল। দেশবাসীর মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। শিশু আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল বিরাট অবদান। শিশু সংগঠন 'কচি কাঁচার মেলা' ও 'চাঁদের হাট'-এর সাথে তিনি জড়িত ছিলেন।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সুফিয়া কামাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে পাকিস্তান বাহিনী তাঁর উপর কড়া নজর রেখেছিল। বাড়ির সামনে সব সময় সেনাবাহিনী থাকতো। এ সময় তাঁর নিরাপত্তার জন্য সোভিয়েত সরকার তাঁকে বিশেষ বিমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হলেন না, বললেন, 'এখন আমি এ দেশ ছেড়ে বেহেশতেও যেতে রাজি নই। আমার দেশের মানুষেরা শান্তি পাক, সোয়াস্তি লাভ করুক- এ দেখে যেন আমি এ মাটিতেই শুয়ে থাকতে পারি।'

মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস তিনি ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের নিজের বাসাতে ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা গোপনে তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের অনেকে চলে যাওয়ার সময় তাঁর কাছে রেশন কার্ড রেখে যান। এই সমস্ত কার্ড

কাজী নজরুল ইসলাম-এর সাথে

দিয়ে তিনি চাল, ডাল ইত্যাদি তুলে নিজের বাসায় জমা করে রাখতেন। মুক্তিযোদ্ধারা সুযোগমতো আসতেন এবং নিয়ে যেতেন। এসময় তিনি নয় মাসে নয়টি কাঁথা সেলাই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'কাঁথা সেলাই করেছি নয় মাসে নয়টি। প্রত্যেকটি ফোঁড় আমার রক্তাক্ত বুকের রক্তে গড়া'। যুদ্ধ শেষে নির্যাতিত মহিলাদের পুণর্বাসনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন তিনি।

এই মহান কবি জীবনে বহু সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৯৯ সালে ২০শে নভেম্বর শনিবার সকালে বার্ধক্যজনিত কারণে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান আমাদের সবার প্রিয় কবি বেগম সুফিয়া কামাল। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২৮শে নভেম্বর তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। ■

আপনার সঞ্চিত অর্থ সোনালী ব্যাংকে বিনিয়োগ করে অধিক লাভবান হউন

সঞ্চয় স্কীমসমূহ ঃ

- সোনালী ডিপোজিট স্কীম (SDS)
- শিক্ষা সঞ্চয় স্কীম (EDS)
- চিকিৎসা সঞ্চয় স্কীম (MDS)
- পল্লী সঞ্চয় স্কীম (RDS)
- বিবাহ সঞ্চয় স্কীম (MSS)

মাসিক উপার্জন প্রকল্প (MES)

আমানতের পরিমাণ	৩ বৎসর মেয়াদে মাসিক মুনাফা/সুদ প্রদেয়	৫ বৎসর মেয়াদে মাসিক মুনাফা/সুদ প্রদেয়
৫০,০০০.০০	৩৭৫.০০	৪২০.০০
১,০০,০০০.০০	৭৫০.০০	৮৪০.০০

মাসিক উপার্জন প্রকল্পে ৫০,০০০.০০ বা এর গুণিতক যে কোন পরিমাণ আমানত সংরক্ষণ করা যাবে এবং মাসিক আয়ও গুণিতক হারে বৃদ্ধিপাবে।

* শর্ত প্রযোজ্য।

- যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক বাংলাদেশী ৫/১০ বছর মেয়াদে এ হিসাব খুলতে পারবেন।
- এ সকল আমানতের বিপরীতে আমানতকারী ৮০% পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং-এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibankbd.com